ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইন- ২

অনুপম সৈকত শান্ত

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ থেকে মুক্তির জন্যে শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার। এর জন্য যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ নিয়ে আইনী ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক যে, শুধু যথাযথ আইন ও বিচার ব্যবস্থা দিয়েই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু আইনের দুর্বলতা বা বিচারে ফাঁকি থাকলে মানুষের যাওয়ার আর কোন জায়গাই থাকে না। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী আইনগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে, তা করতে গিয়ে অন্যান্য দেশের এ সংক্রান্ত কিছু আইনের সাহায্যও নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ কিস্তি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

এইজ অব কনসেন্ট (Age of consent) ও ধর্ষণ

ধর্ষণ কিংবা যৌন নির্যাতন বিষয়ক আইনে এইজ অব কনসেন্ট (Age of consent) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় অসম্মতিতে তথা জোরপূর্বক যৌন সঙ্গম, যৌন স্পর্শ প্রভৃতি ক্রিয়া সংঘটিত করার বিষয়টি রয়েছে, সেহেতু উল্টো দিক দিয়ে বলা যায়, কারো সাথে তার সম্মতিতে তথা স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে সেটি ধর্ষণ/যৌন নিপীড়ন হবে না। এ রকম ক্ষেত্রেই সম্মতি প্রদানের সক্ষমতা বা সামর্থ্যের প্রসঙ্গটি চলে আসে এবং ব্যতিক্রম হিসেবে কিংবা সম্মতির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন দেশের আইনে সম্মতির সীমারেখা বিবৃত হয়েছে। যেমন–আমাদের আইনে 'প্রতারণা'পূর্বক সম্মতি আদায় করে যৌন সঙ্গম করলেও সেটি ধর্ষণ হবে, এ অনুযায়ী বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সম্পর্ক করার পরে সম্পর্ক ভেঙে গেলেও অনেকে ধর্ষণের মামলা করে বসে। বিভিন্ন দেশের আইনে, অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, ঘুমে থাকা, অচেতন, ড্রাগ দেয়া ব্যক্তিকে, সামাজিক দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে 'অসম্মতি' হিসেবে বলা হয়েছে। একইভাবে সমস্ত আইনেই একটি নির্দিষ্ট বয়সের নিচের শিশুদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সম্মতিকে অসম্মতি হিসেবে ধরা হয়। এই বয়সটিই হচ্ছে এইজ অব কনসেন্ট।

Age of consent এর সরাসরি বাংলা 'সম্মতি দেয়ার বয়স' হলেও আসলে কিন্তু সেটি দিয়ে যে কোনো কিছুতে সম্মতি দেয়ার বয়স বোঝায় না। এটি একটি আইনি ভাষা যার অর্থ হচ্ছে : "এইজ অব কনসেন্ট বলতে কোনো ব্যক্তির সেই ন্যূনতম বয়স, যার ফলে সেই ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি লাভ করে।" যদিও অনেক সময় একে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যে এইজ অব কনসেন্ট বলতে সেই ন্যূনতম বয়স বোঝায়, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো সাথে যৌনকর্মে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সম্মতি প্রদানে সক্ষম বলে ধরা হয়। এইজ অব কনসেন্ট সম্পর্কিত আইনের উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে : "এই ন্যূনতম বয়সের চাইতে কম যার বয়স তাকে আক্রান্ত এবং তার সাথে যৌনকর্মে অংশ নেয়া ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে" (The age of consent is the minimum age of a person with whom another person is permitted to engage in certain sexual activities, though it sometimes is defined as the age at which a person is considered to be legally competent to consent to sexual acts, and is thus the minimum age of a person with whom another person is legally permitted to engage in sexual activity. The distinguishing aspect of the age of consent laws is that the person below the minimum age is regarded as the victim, and their sex partner as the offender)।[৭] ফলে আইনে সরাসরি Age of consent লেখা থাকুক আর না থাকুক, যে জায়গাটিতে নির্দিষ্ট বয়সের নিচে যৌন সম্পর্কের সম্মতি দিলেও সেটাকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হবে. সেই জায়গাটিকেই 'এইজ অব কনসেন্ট' নির্দেশ করার আইন বলা হয় এবং যে বয়সের নিচে যৌন সম্পর্কের সম্মতি দিলেও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় সেই বয়সকে Age of consent বলা হয়। একেক দেশের আইনে এইজ অব কনসেন্ট একেক রকম। আমাদের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯ নম্বর ধারার ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয় : "ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন"–সেটার মানেই হচ্ছে, এই আইন অনুসারে বাংলাদেশে Age of consent হচ্ছে ১৬ বছর। যুক্তরাজ্যের Sexual Offences Act ২০০৩ এর ১ ও ৫ নম্বর ধারায় যথাক্রমে 'ধর্ষণ' (Rape) এবং '১৩ বছরের কম বয়সী শিশুর ধর্ষণ' (Rape of a child under 13) এর সংজ্ঞায় সব কিছু হুবহু একই, কেবল ১ নম্বর ধারার সংজ্ঞায় উল্লেখিত "ই (আক্রান্ত) does not consent to the penetration" লাইনটি ৫ নম্বর ধারায় নেই; অর্থাৎ সেখানে এইজ অব কনসেন্ট হচ্ছে ১৩ বছর। ভুটানের আইনে এইজ অব কনসেন্ট ১২ বছর, নেদারল্যান্ডের আইনে এটি ১৬ বছর, কানাডার আইনে কিছু ব্যতিক্রমসহ এটি ১৬ বছর।

এইজ অব কনসেন্টের সাথে আরো কয়েকটি বয়সসীমা সংক্রান্ত বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেমন :

–শিশুর সংজ্ঞায় শিশুর বয়স
–বিয়ের ন্যূনতম বয়স
–এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি

শিশুর সংজ্ঞায় শিশুর বয়স

আমাদের অধিকাংশ আইনেই শিশুর সংজ্ঞায় ১৮ বছরের কম বয়সের ব্যক্তির কথা বলা হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২(ট) ধারায় শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : (ট) "'শিশু' অর্থ অনধিক ষোল (১৬) বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি।" অবশ্য বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এ 'শিশু' শব্দটির বদলে 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সংজ্ঞায় জানানো হয়েছে : 'অপ্রাপ্তবয়স্ক' অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেননি এমন কোন পুরুষ এবং ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ করেননি এমন কোন নারী এবং 'প্রাপ্তবয়স্ক' অর্থ বিবাহের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ করেছেন এমন কোন পুরুষ এবং ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ করেছেন এমন কোন নারী। অন্যদিকে শিশু আইন ২০১৩ এর ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, "অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।"

বিয়ের ন্যূনতম বয়স

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ অনুযায়ী : "'বাল্যবিবাহ' অর্থ এইরূপ

বিবাহ, যাহার কোন এক পক্ষ বা উভয় পক্ষ অপ্রাপ্ত বয়স্ক।" অর্থাৎ সাধারণভাবে বিয়ের ন্যূনতম বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮ বছর। কিন্তু নতুন এই আইনটিতে বিশেষ বিধান নামে একটি ধারা (ধারা-১৯) যুক্ত করে আরো কমবয়সী শিশুদের বিয়ের অনুমোদনও দেয়া হয়েছে। ধারা-১৯ অনুযায়ী : "এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।"

এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি

এর অর্থ অপরাধ করার ন্যূনতম বয়স। কথায় আছে, শিশুরা ফুলের মতো নিষ্পাপ। অন্য কথায়, শিশুরা পাপ করতে পারে না, বা পাপ শিশুদের ছুঁতে পারে না। প্রচলিত এই কথাগুলোর কিছুটা প্রতিফলন ঘটে এসংক্রান্ত ধারাসমূহে। অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিশুদের যে কোনো অপরাধকে অপরাধ হিসেবেই ধরা হয় না, ওই বয়সে কারো কোনো কর্মই অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না এবং ৯ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে কোনো কর্ম অপরাধ হবে না যদি সেই কর্মটির প্রকৃতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে বোঝার মতো পরিপক্বতা ওই শিশুটির না থাকে। দণ্ডবিধি ৮২ : "নয় বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে" (Nothing is an offence which is done by a child under nine years of age.)। দণ্ডবিধি ৮৩ : "নয় বৎসরের অধিক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক এমন শিশু কর্তৃক কৃত কোন কিছুই অপরাধ নহে, উক্ত অপরাধের ব্যাপারে যে শিশুর বোধশক্তি এতদূর পরিপক্বতা লাভ করে নাই যে, সে স্বীয় আচরণের প্রকৃতি ও পরিণতি বিচার করিতে পারে" (Nothing is an offence which is done by a child above nine years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion)। উল্টো দিক দিয়ে বলা যায়, ৯ বছরের ওপরের কিংবা মানসিক পরিপক্বতাহীনতার ক্ষেত্রে ১২ বছরের ওপরের কোনো শিশু অপরাধ করতে সক্ষম হিসেবে ধরা হয়। আমাদের আইনে এইজ অব কনসেন্ট (১৬ বছর) ও এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটির (৯ বছর) পার্থক্য হচ্ছে ৭ বছর। অনেক সময় মনে করা হয়, ধারা-৯০ অনুযায়ী যেহেতু শিশুর সম্মতির বয়স ১২ বছর বলা হয়েছে (Unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under twelve years of age), সেহেতু এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে ১২ বছর। বাস্তবে ৯০ ধারাটি 'Unless the contrary appears from the context' নির্দেশ করে যে এটিতে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে শিশুদের সম্মতির কথা বলা হয়েছে। এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি সম্পর্কিত ধারা 'দণ্ডবিধি'র ৮২ ও ৮২ এবং শিশু আইন ২০১৩। সে অনুযায়ী এটি সাধারণভাবে ৯ বছর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১২ বছর।

এইজ অব কনসেন্টের সাথে এই ধারাগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। যদিও বলা হয়, এইজ অব কনসেন্টের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের বয়স, অপরাধ করার বয়স (এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি), বিয়ের ন্যূনতম বয়স, ভোট প্রদানের বয়স, পান করার বয়স প্রভৃতিকে মিলিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় (Age of consent should not be confused with the age of majority, age of criminal responsibility, the marriageable age, the voting age, the drinking age, or other purposes.), তদুপরি বিভিন্নভাবেই এগুলো ধর্ষণের মামলাকে প্রভাবিত করে থাকে। বিয়ের ন্যূনতম বয়স আর এইজ অব কনসেন্টের পার্থক্য নির্দেশ করে যে যৌন সম্মতি দেয়ার বয়স হওয়ার পরেও একজন বিয়ে করার উপযোগী না-ও হতে পারে।

আমাদের দেশে যৌন সম্মতির ন্যূনতম বয়স ১৬ আর বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছরকে দেখিয়ে অনেক সময় এই যুক্তি করা হয় যে ১৬ বছরে একজন যৌনভাবে সক্ষম হতে পারলে কেন সে বিয়ে করতে পারবে না। এই যুক্তিতে বিয়ের ন্যূনতম বয়স কমিয়ে ১৬ বছর করার পক্ষে তাঁরা যুক্তি দেন। তাঁরা ভুলে যান যে স্রেফ যৌনতা আর বিয়ে করা এক বিষয় নয়, বিয়ের সাথে সাথে একটি সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে চলে আসে, নারীদের সন্তান ধারণের বিষয় চলে আসে এবং এর ফলে স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন শেষে কর্মক্ষম হওয়ার সুযোগ নষ্ট হওয়ার ব্যাপারও জড়িত। উল্টো দিকে অনেক নারীবাদী সংগঠন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর এইজ অব কনসেন্ট বাড়িয়ে ১৮ বছর করার দাবি তোলেন এই যুক্তিতে যে এতে ধর্ষণের মামলার ভয়েও বাল্যবিবাহ অনেকাংশ কমে যাবে। এমন যুক্তির বাস্তব ভিত্তিও আছে, কেননা আমাদের দেশে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী নারীর মধ্যে বাল্যবিবাহের হার সর্বাধিক। একই সাথে এই বয়সী নারীর মাঝে শিশুমাতৃত্বের হারও আশঙ্কাজনকভাবে বেশি।

ইউনিসেফের তথ্য মতে, ১৮ বছর বয়সের আগেই ৬৬ শতাংশ নারীশিশু বাল্যবিবাহ করতে বাধ্য হয়, যার দুই-তৃতীয়াংশের বয়সই ১৫-১৮ বছরের মধ্যে।[৮] অবশ্য অন্য একটি বেসরকারি গবেষণার তথ্য মতে, বিগত দশকে বাল্যবিবাহের হার কমে হয়েছে ৪৩ শতাংশ। এর বড় অংশই কমেছে ১৫ বছরের নিচে।[৯] অবশ্য বাল্যবিবাহ নিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং আইন অমান্যে সাজার পরিমাণ বাড়ানোর মধ্য দিয়েও বাল্যবিবাহের হার কমানোর দাবি প্রায় সকল নারীবাদী ও মানবাধিকার সংগঠনের। এ বছর বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-তে আগের তুলনায় সাজার পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও আইনে বিশেষ বিধানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের বিশেষ আইনি অনুমোদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তদুপরি আইনের প্রয়োগের ব্যাপারে বিশেষ অভিযান চালানো, প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে জনসচেতনতা তৈরি প্রভৃতি পদক্ষেপও চোখে পড়ছে না।

বিয়ের ন্যূনতম বয়স এবং এইজ অব কনসেন্টের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য সাম্প্রতিক একটি রায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়।[১০] এই রায়ে ধর্ষণের অভিযোগ থেকে এক ব্যক্তি কেবল মুক্তই হননি, ধর্ষিতার সাথে তার বিয়েও হয়। আমাদের ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলাগুলোর একটা অংশ বিয়ের উদ্দেশ্যে করা হয়। অর্থাৎ কোনো নারীর সাথে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পর, এমনকি তাকে সন্তানসম্ভবা করার পর পুরুষটি যখন আর তাকে বিয়ে করতে চায় না, তখন নারীটি উপায়হীন হয়ে ধর্ষণের মামলা করে বসে। জেল-জরিমানা থেকে বাঁচতে পুরুষটি তখন বাধ্য হয় বিয়ে করতে। আলোচ্য ওই মামলাটিতেও ধর্ষক পুরুষটি ১৩ বছরেরও কম বয়সী একটি মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক করলে একটা সময় যখন মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তখন সে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায় (মামলার সময়কালে মেয়েটির বয়স ছিল ১৩ বছর ৮ মাস)। ফলে মেয়েটির পরিবার ধর্ষণের মামলা করে বসে এবং গত তিন বছর ধর্ষণের দায়ে জেলখানায় ছিল ওই পুরুষটি।

এ বছর বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ পাস হওয়ার পরপরই এ আইনের বিশেষ বিধান মোতাবেক ১৮ বছরেরও কম বয়সী নারীকে বিয়ে করার অনুমোদন মেলায় ধর্ষণের মামলা তুলে নেয়া হয় এবং ওই পুরুষটি ১৬ বছরের ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি হয়। মেয়েটি ও তার পরিবারও খুশি মনে মেনে নেয়, কেননা বাচ্চা মেয়েটির সন্তানের বয়সই এখন এক বছরের বেশি, যে সন্তানটি এই সমাজের জন্য আবশ্যকীয় পিতৃপরিচয়টি এর মধ্য দিয়ে লাভ করছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ বিধানের সর্বপ্রথম প্রয়োগ এই মামলাটির রায়ে ঘটে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা-৯ অনুযায়ী (মেয়ের বয়স ১৬ বছরের কম) কিংবা 'দণ্ডবিধি'র ধারা-৩৭৫ অনুযায়ী (মেয়েটির বয়স ১৪ বছরের কম এবং সে অবিবাহিত) আলোচ্য ঘটনাটিতে মেয়েটিকে ধর্ষণই করা হয়েছিল; অথচ আদালত ধর্ষণের বিচার না করে বিয়ে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করেছে এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর বিশেষ বিধান তাদের অপেক্ষা ২ বছর কমিয়ে দিয়েছে বলেই মনে হয়েছে (বিশেষ বিধানটি না থাকলে সম্ভবত মেয়েটির বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত সেই অপরাধীকে কারাভোগ করতে হতো)!

এইজ অব কনসেন্ট বনাম এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি

এইজ অব কনসেন্টের কম বয়সী শিশু ধর্ষণের মামলায় অনেক সময় এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আক্রান্তের ওপর দোষ (victim blaming) চাপিয়ে দেয়ার নিমিত্তে। যে কোনো ধর্ষণের মামলায়ই আসামিপক্ষের আইনজীবীদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে যৌন সঙ্গমের ঘটনাটি যে উভয়ের সম্মতিতেই হয়েছে, সেটি প্রমাণ করা এবং সে জায়গা থেকেই ধর্ষিতার 'চরিত্রহানি'র চেষ্টা থাকে। এইজ অব কনসেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু শিশুদের সম্মতি থাকলেও সেটি ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়, সেহেতু এ ক্ষেত্রে অন্যভাবে যুক্তি হাজির করা হয়। যেমন–আক্রান্তের বয়স সম্পর্কে আসামি অজ্ঞাত ছিল, আক্রান্তই তার বয়স লুকিয়েছিল বা ভুলভাবে বাড়িয়ে উপস্থাপন করেছিল, আসামির প্রতি শত্রুতাপূর্বক ফাঁদে ফেলার জন্যই এমনটি করেছিল ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আইনি পরিভাষায় এর চেয়ে বেশি বয়সী ব্যক্তি শিশু হলেও (১৮ বছরের নিচে হলেও) সে অপরাধ করতে সক্ষম।

আমাদের আইনে সুনির্দিষ্টভাবেই বলা হয়েছে, ৯ বছরের কমে শিশুদের অপরাধ বোঝার মতো বোধবুদ্ধি হয় না বিধায় তারা কোনো অপরাধ করে ফেললেও সাজা দেয়া যাবে না। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী বলা হয়েছে, ১৬ বছরের শিশুর যৌনতার ক্ষেত্রে স্বাধীন সম্মতি দেয়ার মতো অবস্থা হয়নি; ফলে এই বয়সী কারো সম্মতি থাকার পরও যৌন সম্পর্ক করলে সেটিকে সম্মতি হিসেবে না ধরে প্রাপ্তবয়স্ক কারো প্রলুব্ধকরণ হিসেবে (খাঁটি বাংলায় 'ফুসলানো') ধরা হয় এবং সেটি ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের আইনে যৌনতার ক্ষেত্রে সম্মতির ব্যাপারে বয়সসীমা ১৬ রাখা হয়েছে। ১৬-র নিচে কেউ যদি সেই সম্মতি দেয় তাহলে সে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ করছে না। ১৬ বছরের নিচের কেউ এই রকম সম্মতি দেয়ার মতো পরিপক্ব অবস্থানে না-ও থাকতে পারে, তাকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তার অবস্থান, অভিজ্ঞতা, অর্থবিত্ত, খেলার সামগ্রী বা চকোলেটের লোভ দেখিয়ে বা ইফতারের দাওয়াত দিয়ে, গল্প শোনানোর কথা বলে, একসাথে খেলার কথা বলে, কিংবা আদর করার ছলে ইত্যাদি নানা কায়দায় প্রলুব্ধ করে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত করতে পারে! ফলে এই আইনটি সেই সব ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুকে রক্ষা করতে এবং ওই সব লোক যারা এমন নারীশিশুকে প্রলুব্ধ করতে পারে তাদের বাধা দিতেই এই এইজ অব কনসেন্টের প্রয়োজন। সেটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। শিশুর যৌন পরিবর্তনের বয়স, সামাজিক পরিমণ্ডলে যৌনতাকেন্দ্রিক ধারণা, অল্প বয়সে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার সমস্যা-সংকট সম্পর্কে সামাজিক গবেষণা–এমন অনেক বিষয়ই এখানে বিবেচ্য।

আগেই বলা হয়েছে, ধর্ষণের মামলায় আসামিপক্ষের আইনজীবীর চেষ্টা থাকে ধর্ষিতাকেই অভিযুক্ত বা দোষী হিসেবে দেখানোর। ফলে সে ক্ষেত্রে তিনি দণ্ডবিধির ৮২/৮৩/৯০ ধারা দেখান এই জায়গা থেকেই যে যেহেতু ভিকটিমের বয়স ১২-র বেশি, সেহেতু সেও অপরাধ করার এবং কোনো একটি অপরাধে সম্মতি দিতে সক্ষম। এখন অপরাধকর্মটি কী? উভয়ের সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু যৌন সম্পর্ক তো আইনের চোখে অপরাধ নয়। আইনের ভাষায় ধর্ষণ অপরাধ, যার সংজ্ঞায় একটি নির্দিষ্ট বয়সের নিচের শিশুর সম্মতিতেও যৌন সম্পর্ক হচ্ছে ধর্ষণ। এই অপরাধটিকে গণনায় ধরলে সে তো ভিকটিম হয়ে যাচ্ছে, অপরাধী হচ্ছে না। ফলে অপরাধ করার ব্যাপারে সক্ষম হলেই তো কেবল হচ্ছে না, জানাতে হবে অপরাধটি কী? তখন তার আরো অপরাধ উপস্থিত করা হয় বা আসামিপক্ষের আইনজীবী নানা রকম অপরাধ প্রমাণের চেষ্টা করেন। যেমন–আসামিকে ফাঁসাতে চেয়েছে কিংবা অন্য কোনো শত্রুতা থেকে, জিঘাংসা থেকে আসামিকে প্রলুব্ধ করে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে বিপদে ফেলতে চেয়েছে, কিংবা ব্ল্যাকমেইল করার উদ্দেশ্যে এমন করছে; অর্থাৎ কোনো না কোনো অপরাধের 'গল্প' হাজির করতে হবে। সেদিক থেকে দেখলে, Age of Consent আর Age of Criminal Responsibility এক হলে ভালো, এতে আসামিপক্ষ থেকে এ রকম প্রচেষ্টা কমে এবং মামলা চলাকালে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর অহেতুক মানসিক নির্যাতনও কমে।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আইনে এইজ অব কনসেন্ট ও এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটির পার্থক্য বেশ কম। ইউরোপের অনেক দেশেই এ দুটি একই (যেমন : সুইডেন–১৫ বছর, অস্ট্রিয়া–১৪ বছর, বেলজিয়াম–১৬ বছর, চেক রিপাবলিক–১৫ বছর, ইতালি–১৪ বছর)। ইউরোপে গড়পড়তায় এইজ অব কনসেন্ট ১৫ বছর এবং এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে ১৪ বছর। অর্থাৎ গড়পড়তায় পার্থক্য মাত্র এক বছর। কিছু দেশে তো এইজ অব কনসেন্টের চেয়ে এইজ অব ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি বেশি (যেমন : স্পেন–১৩ বছর ও ১৪ বছর, লুক্সেমবার্গ–১৬ বছর ও ১৮ বছর, পর্তুগাল–১৪ বছর ও ১৬ বছর)। অর্থাৎ লুক্সেমবার্গ মনে করে, ১৮ বছরের নিচের কোনো শিশুই আদতে অপরাধ করতে পারে না, যদিও ১৪ বছর পার হলেই সে নিজ ইচ্ছায় বা সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক করার মতো পরিপক্বতা অর্জন করে। একমাত্র মালটায় বাংলাদেশের মতো এইজ ক্রিমিনাল রেসপনসিবিলিটি ৯ বছর, উপরন্তু সে দেশে এইজ অব কনসেন্ট ১৮ বছর হওয়ায় এই দুই বয়সের পার্থক্য সেখানে ৯ বছর![১১]

১২ বছর থেকে বা ১৩ বছর থেকেই একজন নারীশিশুর মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষা, যৌন চাহিদা তৈরি হতে পারে, প্রেম-ভালোবাসার সাথে সাথে যৌন আনন্দ উপভোগের ব্যাপারটাও চলে আসতে পারে। ফলে এই বয়সেই সে স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিক : যে সম্পর্ক সে নিজে থেকে ও নিজ উদ্যোগে

করেছে, সেটির জন্য আরেকজনকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় কি না, দোষী সাব্যস্ত করা হলেও তার জন্য তার শাস্তি অন্য আরেকজন, যে সম্মতি ছাড়াই বলপূর্বক ধর্ষণ করছে তার সমান হতে পারে কি না– এসব প্রশ্নও বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। উদাহরণস্বরূপ ১৯-২০ বছর বয়সের ছেলের সাথে ১৪-১৫ বছরের একটি মেয়ের প্রেমের সম্পর্কের পরে, যৌন সঙ্গমের পরে কোনো কারণে মেয়েটি বা মেয়েটির পরিবার যদি মামলা করে, আমাদের আইন অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে ওই ছেলেটির সাজার পরিমাণ হওয়ার কথা যাবজ্জীবন কারাভোগ! এটি কি তার জন্য অতিরিক্ত শাস্তিই মনে হয়; যদিও একই কর্ম যদি ৪০-৫০ বছরের কোনো ব্যক্তি করে, সে অপরাধে কঠোর সাজা হওয়াই দরকার। ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের আইনে এইজ অব কনসেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যাপারও আছে। যেমন– কানাডার আইনে এইজ অব কনসেন্ট ১৬ বছর হলেও ১২ বছর বয়সের নিচের শিশুর সাথে যৌন সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই, কিন্তু ১২ ও ১৩ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অনধিক ২ বছর আর ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ বছর বয়স পার্থক্যের ব্যক্তির সাথে প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে ছাড়ের আওতায় পড়বে, অর্থাৎ এটি ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

এইজ অব কনসেন্ট আর বৈধ বিবাহের ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত আইন দুটি পাশাপাশি রাখলে একটি ব্যাপার সামনে আসে। আমাদের রাষ্ট্র জানাচ্ছে, ১৬ বছরের কম বয়সের নারীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে ধর্ষণ হবে, আবার একই সাথে জানাচ্ছে, নারীর বৈধ বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। অর্থাৎ ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত নারীর বিয়ে করার অনুমতি নেই, কিন্তু যৌন সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধাও নেই। কেননা আমাদের কোনো আইনেই বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের বিরুদ্ধে কোনো বিধান নেই। কেবল 'দণ্ডবিধি'র ৪৯৭ ধারা অনুযায়ী ব্যভিচার বা অ্যাডাল্টেরির উল্লেখ আছে, কিন্তু সেটি যে কোনো বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জন্য প্রযোজ্য নয়। এটি হচ্ছে, আমাদের প্রচলিত ভাষায় যেটা পরকীয়া, তার জন্য। সেটিও কেবল পরস্ত্রীর সাথে ওই স্ত্রীর স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সম্পর্ক (পরস্বামীর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো বিধান নেই) এবং এই অপরাধ কেবল যে পুরুষ পরস্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে তার। এর জন্য ওই পুরুষের শাস্তি হবে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাভোগ, কিন্তু সেই পরস্ত্রী যিনিও এ রকম যৌন সম্পর্কে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হচ্ছেন, তিনি কিন্তু আইনের চোখে নিরপরাধ। এর বাইরে আর কোনো যৌন সম্পর্ক, যেটি ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়ন নয়, সেটি অপরাধ নয়–বিয়ে হোক বা না হোক। সমাজে একে ব্যভিচার, লাম্পট্য বা অসামাজিক কার্যকলাপ– যা কিছুই বলা হোক না কেন, আইনের চোখে এসব যৌন সম্পর্কের জন্য কারোর কোনো শাস্তি হবে না (অপ্রাকৃতিক যৌন সম্পর্কের জন্য অবশ্য দণ্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। পশুকাম ও সমকাম এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ)। ফলে এটি স্পষ্ট যে এ ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র এতখানি মানবিক যে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো রকম খবরদারি করে না। আবার একই সাথে এটাও বলা যায় যে রাষ্ট্র ঠিক ততখানিই অমানবিক যে বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে, তার জন্য ও তার মায়ের জন্য পদে পদে বাধা তৈরি করে রেখেছে। বিশেষ করে সন্তানের পিতৃপরিচয়ের আবশ্যকয়ীতা তৈরি করে রাখার মধ্যে। 'সিঙ্গেল' মায়ের স্বীকৃতি রাষ্ট্রের কাছে নেই। রাষ্ট্রীয় সমস্ত কাগজপত্রে পিতার নাম আবশ্যক। আর আইনের সীমা বাদ দিয়ে যদি সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক– এসব দিক দিয়ে বিবেচনা করি, এই সমাজে এখনো ধর্ষণের চেয়ে প্রেমের সম্পর্ক বড় অপরাধ, এখানে ধর্ষকের চেয়ে ধর্ষিতা সামাজিকভাবে ঘৃণিত।

ধর্ষণ মামলার দীর্ঘসূত্রতা

আমাদের দেশে ধর্ষণের ঘটনা যতখানি ঘটে, তার খুব অল্প অংশই প্রকাশ্যে আসে বা ধর্ষকের বিচার চেয়ে মামলা করা হয়। আবার যতগুলো মামলা হয় সেসবের একটি বড় অংশই বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। যথাসময়ে মামলার নিষ্পত্তি হয় বা মামলার রায় হয় বেশ কম। আর সেই রায়ে অপরাধীর সাজা পাওয়ার হার আরো কম। নারীপক্ষের এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত দেশের ছয়টি জেলায় ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে করা তিন হাজার ৬৭১টি মামলায় মাত্র চারজনের সাজা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার মেয়েদের সারা দেশে ৮টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে কাউন্সেলিং, পুলিশি ও আইনি সহায়তা দেয়া হয়। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসে ২২ হাজার ৩৮৬ জন নারী, এর মধ্যে মামলা হয় ৫ হাজার ৩টি ঘটনায়। এর মধ্যে মাত্র ৮০২টি ঘটনায় রায় দেয়া হয়েছে। আর শাস্তি পেয়েছে মাত্র ১০১ জন! রায় ঘোষণার হার ৩.৬৬ শতাংশ। আর সাজার হার ০.৪৫ শতাংশ। মানবাধিকার নেত্রী অ্যাডভোকেট এলিনা খান এ প্রসঙ্গে বলেন, "বিচারহীনতার কারণে ধর্ষণের সংখ্যা আরো বাড়ছে। আইনে আছে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কারণ দেখিয়ে বাড়তি সময় নেয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মামলা শেষ হতে ১০-২০ বছরও লেগে যাচ্ছে।"[১২]

সুপ্রিম কোর্টের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঢাকার ৫টিসহ সারা দেশে ৫৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এবং ১৮টি জেলা আদালতে ২০১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৪৯ হাজার ২৬৫টি মামলা বিচারাধীন ছিল। এর মধ্যে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ১১ হাজার ৮৯৫টি মামলা। এর আগে ২০১২ সালে সারা দেশে বিচারাধীন ছিল ১ লাখ ২২ হাজার ৬৭৬টি মামলা, একই সময়ে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৪ হাজার ৯৩১টি মামলা। আর ২০১৩ সালে বিচারাধীন ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৩০টি এবং নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৮ হাজার ৯২টি মামলা। ২০১৪ সালে সারা দেশে বিচারাধীন ছিল ১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৯৬টি এবং নিষ্পত্তি হয়েছে ৪০ হাজার ২৯২টি মামলা।[১৩] উল্লেখ্য, কথিত নিষ্পত্তি হওয়া বা রায় হওয়া মামলাগুলোতে আসামির সাজা পাওয়ার হার একেবারেই কম, যার অন্যতম কারণ মামলার এহেন দীর্ঘসূত্রতা। দীর্ঘসূত্রতার কারণে বেশির ভাগ মামলা শেষ পর্যন্ত টেকে না। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সাক্ষীদেরও পাওয়া যায় না। ধর্ষণের মামলা এত দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে দিনের পর দিন বারবার অপমানিত, মানসিকভাবে লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হওয়ার মতো ধৈর্য ও মানসিক শক্তি ধর্ষণের শিকার নারীর অনেক সময়ই থাকে না। তা ছাড়া আসামিরা প্রভাবশালী হলে তাদের পক্ষ থেকে নানা রকম ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বাদীর নিরাপত্তাহানির মতো ঘটনাও আছে। ধর্ষণের মামলার অপরাধে ধর্ষিত ও তার পরিবারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা, এমনকি হত্যা করা ও পুনরায় ধর্ষণ করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। ফলে অনেক সময়ই ভয়ে নির্যাতিতরা আদালতে এসে সাক্ষ্য দিতেও অনীহা প্রকাশ করে। ধর্ষণের শিকার নারীশিশুর পরিবার গরিব হলে অনেক সময়

টাকা-পয়সা দিয়ে বা নানা রকম চাপ প্রয়োগ করে আপোস করে ফেলা হয়। এভাবে ধর্ষকরা পার পেয়ে যায়। সে জায়গা থেকেই নারী আন্দোলনের নেত্রীরা ও মানবাধিকারকর্মীরা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির দাবি তুলে এসেছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২০ নম্বর ধারার ১, ২ ও ৩ নম্বর উপধারায় এসংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক বিধান যুক্ত হয়েছে :

"২০। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ২৫ এর অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা চলিবে।

(৩) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।"

এই হিসাবে মামলাগুলো ৬ মাসের মধ্যেই নিষ্পত্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিধান তিনটি উপধারা-৪ এর প্রতিবিধানের মাধ্যমে একেবারেই গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়েছে :

"(৪) উপধারা (৩) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, ট্রাইব্যুনাল মামলার আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।" ১৮০ দিন তথা ৬ মাসের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত করার যে নির্দেশনা সেটি একতরফাভাবে ট্রাইব্যুনালের প্রতি, কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা তথা নির্বাহী দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি পরিপূরক কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে অধিকাংশ তদন্ত কর্মকর্তার গাফিলতি, তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, সাক্ষীদের হাজির করার দুর্বলতা–এ রকম নানা কারণ দেখিয়ে ট্রাইব্যুনাল মামলা ঝুলিয়ে রাখে। ৬ মাস ঝুলিয়ে রাখতে পারলে আসামির জামিন পাওয়ার সুযোগও অনেক সময় আসামিপক্ষ কাজে লাগাতে চায়। আর ৫ নম্বর উপধারা মোতাবেক মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিচারক বদলি হলে, তিনি অপরিহার্য মনে করলে একই সাক্ষীকে পুনরায় তলব করতে পারবেন, যা প্রকারান্তরে মামলাকে আরো অনেক বেশি ঝুলিয়ে দেয়!

মামলার দীর্ঘসূত্রিতার এমন শুরু হয় বাস্তবে একেবারে মামলার প্রাথমিক পর্যায়েই, যখন আক্রান্ত নারী থানায় মামলা করতে যায়। থানাগুলোতে ধর্ষণের মামলা করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনা খুবই নৈমিত্তিক ব্যাপার। মামলা করতে আসা আক্রান্ত নারীকে ফিরিয়ে দেয়া, বিভিন্নভাবে অপমান-অপদস্থ করা, এক থানা থেকে অন্য থানায় ঘোরানো, অন্য দিন অন্য সময়ে মামলা করতে আসার কথা বলে ঘোরানো, এমনকি মামলা করার জন্য চাঁদা দাবি করা বা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও ঘটেছে। ধর্ষণের শিকার এক গার্মেন্টকর্মী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ৮ দিন চিকিৎসাসেবা নিয়ে বনানী থানায় ধর্ষণের মামলা করার জন্য গেলে থানার ওসি বি এম ফরমান আলী ১২ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ১৭ দিন ভুক্তভোগীকে নানা অজুহাতে ঘোরাতে থাকেন বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, "ওসি সাহেব আমার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেছেন। আমাকে একের পর এক মানহানিকর প্রশ্ন করতেন। একদিন আমাদের গলাধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বের করার জন্য নির্দেশ দেন অন্য পুলিশ সদস্যদের। বাধ্য হয়ে ঢাকার আদালতে গিয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করি।"[১৪]

রেইনট্রি হোটেলে দুই ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায়ও মামলা নিতে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছে একই ওসির বিরুদ্ধে। ফলে আমাদের দেশে ধর্ষণ মামলার চক্রটা অনেকটা এ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে : ধর্ষণের ঘটনায় বেশির ভাগ আক্রান্ত নারী মামলাই করতে যায় না, যারাও যায় তাদের মামলা নিতে চায় না বা গড়িমসি করে বা নানাভাবে হয়রানি করে থানা পুলিশ। এসবের মধ্য দিয়ে যেসব মামলাও হয় সেসবের তদন্ত প্রতিবেদনের কাজটি যথাযথভাবে ও যথাসময়ে করা হয় না। তার সাথে অনেক সময়ই যুক্ত হয় প্রভাবশালী ধর্ষকদের সাথে পুলিশ কর্মকর্তার যোগসাজশ। এর পরও তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষী-সাবুদ মিলিয়ে যে মামলা চলে সেটায় যুক্ত অনির্দিষ্টকালের দীর্ঘসূত্রিতা; যার কারণে অনেক সময় মামলার ব্যাপারটাই আক্রান্তের ওপর বোঝার মতো চেপে বসে। এর থেকে বাঁচতে কিংবা প্রভাবশালী ধর্ষকগোষ্ঠীর চাপে বা টাকা-পয়সার লেনদেন প্রভৃতি মাধ্যমে আপোসরফা করে মামলা তুলে নেয় আক্রান্ত। এসবের মধ্য দিয়ে পার হয়ে খুব অল্প কিছু মামলায়ই আসল অপরাধীর সাজা মেলে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ ধর্ষকের জন্য যাবজ্জীবন সাজার বিধান থাকলেও, অর্থাৎ ধর্ষণকে প্রথম সারির অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হলেও আমাদের দেশে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইনগুলোর বিভিন্ন ধারার আলোচনায় দেখা যায়, সমস্ত ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির সুরক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেই, বরং অপরাধী দমনের চেয়ে নানা রকম ফাঁক গলে পালানোর আয়োজনই আছে বিভিন্ন ধারায়। এ রকম অবস্থায় এ রকম আইন পাল্টানো কিংবা সমস্ত যৌন অপরাধ দমনের জন্য স্বতন্ত্র একটি নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; যদিও কেবল আইন পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মতো ঘটনার প্রকোপ যেভাবে বেড়েই চলেছে, সেখান থেকে উত্তরণের জন্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার, দরকার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার। সব কিছুর মূলে দরকার একটি তীব্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, দরকার রাজনৈতিক আন্দোলন।

অনুপম সৈকত শান্ত: লেখক, প্রকৌশলী
ইমেইল: anupam.shaikat@gmail.com

তথ্যসূত্র:

৭। Sexuality Now: Embracing Diversity, 4th Edition by Janell L. Carroll, Wadsworth Publishing, USA, 2012
৮। https://www.unicef.org/bangladesh/children_4866.html
৯। 'বাল্যবিবাহ কমলেও আশঙ্কা রয়েই গেছে', ডিডাব্লিউ, বাংলা, ২৫ নভেম্বর ২০১৬ www.dw.com/bn/a-36524807
১০। "বিশেষ বিধান'-এর বলে প্রথম বাল্যবিবাহ', জাগরণীয়া, ২৩ মার্চ ২০১৭ http://bangla.jagoroniya.com/bangladesh/6926
১১। https://danbunting.wordpress.com /2013 /08/09/ age-of-consent-vs-age-of-criminal-responsibility/
১২। ধর্ষণ মামলায় হাজারে সাজা মাত্র ৪ জনের, সমকাল, ২৮ মে ২০১৭ http://bangla.samakal.net/2017/05/28/296327
১৩। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলা : সাজা হয় হাজারে সাড়ে ৪ জনের, ভোরের কাগজ, ২৯ জুন ২০১৫ http://www.bhorerka-goj.net/print-edition /2015/06/29/39589.php
১৪। ধর্ষিতাকে থানা থেকে বের করে দিয়েছিলেন ওসি ফরমান, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ মে ২০১৭ http://www.bd-pratidin.com/first- page /2017/05/14/231397